Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 47
Website: https://tirj.org.in, Page No. 423 - 434
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, Published on April issue 2025, Page No. 423 - 434
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

জীবনানন্দ দাশের কাব্যে বিবর্তনবাদ

মো: আবু বকর ছিদ্দিক
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID : abubakarsiddiquecut@gmail.com

Received Date *10. 04. 2025*
Selection Date *23. 04. 2025*

Keyword
evolution, amoeba, human, Africa, Neolithic, modernism, poems, new stream.

Abstract
Jibanananda Das was a modern poet who followed western esthetics deeply. He used evolution theory of Darwin in many of his poems. But any critic doesn't explain him according to evolution theory. I have found him as an evolutionist poet in this article. My research is qualitative research and all information are collected by secondary sources. In his poems Jibanananda Das supported that mankind is the result of evolution. At first, life being produced in water of sea as bacteria then they increased themselves as amoeba. Poet feels that he was lived in the water of sea that time. In course of time amoeba toke visible body. Poet and his darling were stayed as two pearls in the belly of mother oyster. He saw the horse of Neolithic age in field of present earth. Thus he applied the evolution theory in his poems. It makes a new area in history of Bangla literature.

Discussion

জীবনানন্দ দাশ বাংলা কবিতায় বিবর্তনবাদকে নন্দনতত্ত্ব হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তিনি স্যুরিয়ালিস্ট কবি। স্যুরিয়ালিজমের মাধ্যমে এ প্রয়োগ সম্ভব হয়। মানুষের উদ্ভবতত্ত্বের এ আধুনিক প্রত্যয় বাংলা সাহিত্যকে মধ্যযুগীয় কাল্পনিক সৃষ্টিতত্ত্ব থেকে পুরোপুরি মুক্তি দেয়। প্রায় সকল মধ্যযুগীয় সাহিত্যেই সৃষ্টিতত্ত্ব বিদ্যমান ছিল। বিশ্বসৃষ্টি, মানব সৃষ্টি, শ্রষ্টা বন্দনা প্রভৃতি ছিল মধ্যযুগীয় সাহিত্যের একটি অপরিহার্য অংশ। আধুনিক যুগে মাইকেল মধুসূদন দত্ত, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজরুল ইসলাম এ ধারাকে একটু পরিশীলিত করে প্রলম্বিত করেছেন। রবীন্দ্রনাথ ব্রহ্মে বিশ্বাসী ছিলেন। নজরুল ইসলাম একক নামে ঈশ্বরকে সম্বাধন করেননি। তার ঈশ্বর সকল ধর্মে বিরাজমান। কিন্তু জীবনানন্দ দাশ ঈশ্বরে বিশ্বাসী ছিলেন না। তিনি ঈশ্বরের স্থানে বসিয়েছেন বিবর্তনবাদেকে। মানুষ সৃষ্টি হয়নি, প্রাণের বিবর্তন ধারায় মানুষ উন্নত শ্রেণির জীব; এটিই জীবনানন্দ দাশের অনুসৃত মানুষের উদ্ভবতত্ত্ব। অর্থাৎ জীবনানন্দ দাশ সৃষ্টিতত্ত্বে নয় মানুষের উদ্ভবতত্ত্বে বিশ্বাসী। তার কাব্যসমগ্রে পর্যায়ক্রমে তার এ চিন্তা শৈল্পিক রূপ পেয়েছে।

জীবনান্দ দাশ ছিলেন অভিজ্ঞতাবাদী। বুদ্ধি ও স্বজ্ঞা দিয়ে যে ঈশ্বরকে উপলব্ধি করেন ভাববাদীরা, অভিজ্ঞতা দিয়ে তিনি সে ঈশ্বরকে খুঁজে পাননি। তিনি পৃথিবী, গ্রহ-নক্ষত্র, আলো-বাতাস, জল নিয়ে নিরীক্ষা করে এর মধ্য থেকে উত্তর পেতে আগ্রহী। তার মতে, "গভীরভাবে জেনেছি যে সব সকাল বিকাল নদী নক্ষত্রকে/ তারি ভিতর প্রবীণ গল্প নিহিত

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 47
Website: https://tirj.org.in, Page No. 423 - 434
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

হয়ে রয়।" ('আজকে রাতে', বেলা অবেলা কালবেলা) তিনি নিজের মধ্যে একটি ক্ষমতাও অনুভব করেন। তা দিয়ে তিনি পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে ফলাফল পেতে চান।

"আমারে দিয়েছ তুমি হৃদয়ের যে এক ক্ষমতা
ওগো শক্তি, — তার বেগে পৃথিবীর পিপাসার ভার
বাধা পায়, জেনে লয় নক্ষত্রের মতন স্বচ্ছতা!
আমারে করেছ তুমি অসহিষ্ণু— ব্যর্থ— চমৎকার!
জীবনের পারে থেকে যে দেখেছে মৃত্যুর ওপার,
কবর খুলেছে মুখ বার—বার যার ইশারায়,
বীণার তারের মতো পৃথিবীর আকাঙ্ক্ষা তার
তাহার আঘাত পেয়ে কেঁপে কেঁপে ছিঁড়ে শুধু যায়!"

('অনেক আকাশ', ধূসর পাণ্ডুলিপি)

প্রত্নতত্ত্ব, প্রাচীন কবর, ফসিল এ সবের মধ্যে পৃথিবীর ইতিহাস সংরক্ষিত রয়েছে। কবি এসব থেকে মানুষের উৎপত্তির সঠিক ইতিহাস উদ্ধার করতে চান। তিনি বলেন, -

"মাটির নিচের থেকে তারা/ মৃতের মাথার স্বপ্নে ন'ড়ে ওঠে জানায় কি অদ্ভুত ইশারা!"

('অবসরের গান', ধূসর পাণ্ডুলিপি)

প্রচলিত সৃষ্টিতত্ত্বকে পাশ কাটিয়ে কবি বিবর্তনবাদকে মানুষের উদ্ভবতত্ত্ব হিসেবে গ্রহণ করেছেন এবং কবিতায় তার শৈল্পিক প্রয়োগ ঘটিয়েছেন। বিবর্তনবাদ তার সৃষ্টিকর্মে, তার নন্দনতত্ত্বের ভিত্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এতে মধ্যযুগীয় ধারা থেকে মুক্তির পথ পেয়েছে বাংলা সাহিত্য।

জীবনানন্দ দাশের কবিতায় প্রাণ, অ্যামিবা, ডাইনোসর, প্রস্তরযুগ প্রভৃতি শব্দ, চিত্রকল্প ও পরিবেশের ব্যবহার প্রশ্নবিদ্ধ করে তোলে, জীবনানন্দ দাশ কি বিবর্তনবাদী? এ প্রশ্নের উত্তর খোঁজা হয়েছে চলমান প্রবন্ধে। জীবনানন্দ দাশের কবিতায় বিবর্তনবাদী দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আলোচনা হয়নিই বলা যায়। এ দিকটি আজও পাঠক ও সমালোচকের দৃষ্টির বাইরে রয়ে গেছে। জীবনানন্দ দাশের দর্শন নিয়ে স্বল্প পরিসরে যে আলোচনা হয়েছে তা উল্লেখযোগ্য নয়। আহমদ ছফার প্রবন্ধ 'সকলেই কবি নয় কেউ কেউ কবি : দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে' জীবনানন্দ দাশের দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ বিষয়ক চিন্তাভাবনার বিশ্লেষণ। যতীন সরকার জীবনানন্দ দাশের 'মৃত্যুর আগে' কবিতায় জীবনানন্দ দাশের মৃত্যুদর্শন বিষয়ক একটি নিবন্ধ লিখেছেন 'জীবনের দর্শন, 'মৃত্যুর আগে' ও আস্তিক কবি জীবনানন্দ' শিরোনামে। সাবঅল্টার্ন তত্ত্ব দিয়ে জীবনানন্দ দাশকে ব্যাখ্যা করেছেন ক্লিন্ট বুথ সীলি 'জীবনানন্দের সাবঅল্টার্ন ইতিহাস' প্রবন্ধে। 'জীবনানন্দ : উত্তর—আধুনিকতার দিকে' প্রবন্ধে ফয়সাল শাহরিয়ার জীবনানন্দ দাশের প্রগতিশীল ভাবনার দিকে আলো ফেলেছেন। মাসুদ খানের 'জীবনানন্দ, তাঁর নিজস্ব প্রাচ্য' প্রবন্ধে জীবনানন্দ দাশের প্রাচ্যদর্শন উদ্ঘাটিত হয়েছে। বিবর্তবাদের আলোকে জীবনানন্দের বিচার আজো আড়ালে রয়ে গেছে। সুতরাং জীবনানন্দ দাশের কবিতায় বিবর্তনবাদের অন্বেষণ সম্পূর্ণ নতুন অনুসন্ধান।

এ অনুসন্ধানে আমি গুণগত গবেষণা (Qualitative Research) পদ্ধতি অনুসরণ করেছি। আমার সকল উপাত্তই মাধ্যমিক উৎস (Secondary Source) থেকে সংগৃহীত। ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের মাধ্যমে লক্ষ্য পৌঁছার চেষ্টা করা হয়েছে। জীবনানন্দ দাশের কাব্যসমগ্রের একটি অনুদ্ঘাটিত দিকে আলো ফেলাই আমার উদ্দেশ্য। এর ফলে সাধারণ মানুষের মধ্যে বিবর্তনবাদের সহজ উপলব্ধি ঘটবে। সৃষ্টিতত্ত্বের কাল্পনিক ব্যাখ্যা ও এ সংক্রান্ত কুসংস্কার থেকে মুক্তি পাবে মানুষ। আমার মূলপাঠ (Text) *প্রকাশিত— অপ্রকাশিত কবিতাসমগ্র জীবনানন্দ দাশ,* আবদুল মান্নান সৈয়দ কতৃর্ক সম্পাদিত। অবসার প্রকাশনা সংস্থা এটি ১৯৯৪ খ্রি. ঢাকা থেকে প্রকাশ করে।

১৮৫৯ খ্রি. চার্লস ডারউইনের প্রজাতির উদ্ভবতত্ত্ব *(Origin of Species)* গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। প্রকাশের সাথে সাথে পৃথিবীব্যাপী সমালোচনার ঝড় ওঠে। এত দিনের প্রতিষ্ঠিত কাল্পনিক মতবাদে চরম আঘাত হানে বইটি। এতে

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 47
Website: https://tirj.org.in, Page No. 423 - 434
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

ডারউইন মানুষের উৎপত্তির বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেন। মানুষ বর্তমানে যে রূপে আছে অতীতে সেরূপে ছিল না। অর্থাৎ একটি পরিবর্তন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে জীব জগৎ এগিয়ে চলেছে। ডারউইনের মতে, -

> "পৃথিবীর জীবজন্তু বর্তমানে যে অবস্থায় আছে, শুরুতে সে অবস্থায় ছিল না। এক আদিম সরল অবস্থা থেকে ক্রমিক বিবর্তন— প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে তারা বর্তমানের অপেক্ষাকৃত জটিল অবস্থায় উপনীত হয়েছে।"[১]

এতে প্রতিষ্ঠিত ধর্মীয় সম্প্রদায় ভীষণ ক্ষ্যাপে যায়। ডারউইনের মতবাদ প্রকাশিত হওয়ার পর ধর্মীয় মতবাদ প্রবল নাড়া খায়। কবি বলেন, -

> "বাতাসে ধর্মের কল ন'ড়ে ওঠে— ন'ড়ে চলে ধীরে।"
>
> ('মনোসরণি', *সাতটি তারার তিমির*)

বিবর্তনবাদের মতে সবকিছু প্রকৃতির নিয়মের অধীন। কোন ঈশ্বর সচেতনভাবে মানুষকে তৈরি করেনি এবং মানুষকে নিয়ে তার কোন নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যও নেই। মানুষ প্রকৃতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। কবি বলেন, -

> "আমিও সেই ফলাফলের ভিতরে থেকে গিয়ে
> দেখেছি ভারত লণ্ডন রোম নিউইয়র্ক চীন
> আজকে রাতের ইতিহাস ও মৃত ম্যামথ সব
> নিবিড় নিয়মাধীন।"
>
> ('আজকে রাতে', *বেলা অবেলা কালবেলা*)

ভারত, লন্ডন, রোম, নিউইয়র্কও হারিয়ে যাওয়া ম্যামথের মতই প্রকৃতির অধীনস্থ। ডারউইন বলেন, -

> "জগতে মানুষের কোনো বিশেষ সুবিধাজনক অবস্থান নেই, এবং জাগতিক ব্যাপারে বিধাতার হস্তক্ষেপেরও প্রশ্ন ওঠে না।"[২]

ডারউইনের পর বিবর্তনবাদ নিয়ে শত বছর ধরে পরীক্ষা-নিরীক্ষা, সংযোজন-বিয়োজন, সংশোধন-পরিবর্ধন চলছে। বর্তমানের বিজ্ঞানীদের হাতে বিবর্তনবাদ একটি সরল কাঠামোয় এসে দাঁড়িয়েছে।

প্রাণের উৎপত্তির বিচারে সময়কে কয়েকটি মহাকালে ভাগ করা হয়। যথা –

১. হ্যাডিয়ান মহাকাল
২. আর্কিয়ান মহাকাল
৩. প্রোটেরোজোইক মহাকাল
৪. ফ্যানেরোজোইক মহাকাল

হ্যাডিয়ান মহাকালে (৪৬০-৪০০ কোটি বছর আগে) পৃথিবীতে প্রাণের অস্তিত্ব ছিল না। আর্কিয়ান মহাকালের ইওআর্কিয়ান কালে (৪০০-৩৬০ কোটি বছর আগে) পৃথিবীতে প্রথম প্রাণের উৎপত্তি ঘটে।[৩] এ সময় প্রাণ উদ্ভবের পরিবেশ ছিল পৃথিবীতে। গোটা পৃথিবীই ছিল একটি গর্ভাশয়ের মত।

> "পৃথিবীর উপরিভাগে তখন ছিল জল ও পাহাড় ও তাকে ঘিরে হাইড্রোজেন, অ্যামোনিয়া, মিথেন ও জলীয় বাষ্পের বায়বীয় আবরণ। তারই মধ্যে ঘটে যাচ্ছিল আগ্নেয়গিরির প্রচন্ড অগ্ন্যুৎপাত ও বজ্রপাতের বিদ্যুৎচমক আর সূর্য থেকে অতিবেগুনী রশ্মির বিকিরণ। এই অবস্থার মধ্যেই পৃথিবীতে প্রাণ শুরু হওয়ার আয়োজন চলছিল।"[৪]

কবির ভাষায় –

> "মনে হয় প্রাণ এক দূর স্বচ্ছ সাগরের কূলে
> জন্ম নিয়েছিলো কবে;
> পিছে মৃত্যুহীন জন্মহীন চিহ্নহীন
> কুয়াশার যে ইঙ্গিত ছিলো—

সেইসব ধীরে ধীরে ভুলে গিয়ে অন্য এক মানে
পেয়েছিলো এখানে ভূমিষ্ঠ হ'য়ে আলো জল আকাশের টানে;
কেন যেন কাকে ভালোবেসে।"

('যাত্রী', *শ্রেষ্ঠ কবিতা*)

কবির মতে, প্রাণ উৎপন্ন হওয়ার আগে জন্মহীন, মৃত্যুহীন, চিহ্নহীন, কুয়াশাময় ছিল পৃথিবী। আলো, জল, আকাশের টানে, কাকে যেন ভালোবেসে ধীরে ধীরে প্রাণের উদ্ভব ঘটে। অমল দাস গুপ্ত বলেন, -

> "একদিকে রয়েছে অ্যামিনো অ্যাসিড, অন্যদিকে নিউক্লিক অ্যাসিড তৈরি হওয়ার মূল দুটি উপাদান- শর্করা ও ক্ষার। অ্যামিনো অ্যাসিড থেকে জলের অণু বিয়োজিত হয় এবং সেটি হয়ে ওঠে প্রোটিন। শর্করা ও ক্ষার থেকে দুটি ধাপ পার হয়ে পাওয়া যায় নিউক্লিক অ্যাসিড-আর-এন-এ ও ডি-এন-এ। প্রথম ধাপে নিউক্লিয়োসাইড, তার সঙ্গে ফসফেট যুক্ত হবার পরে দ্বিতীয় ধাপে নিউক্লিয়োসাইড, তার থেকে জলে অণু বিয়োজিত হবার পরে তৃতীয় ধাপে আর-এন-এ ও ডি-এন-এ। পরিশেষে প্রোটিন ও নিউক্লিক অ্যাসিড মিলে গিয়ে সৃষ্টি হয় প্রাণ।"[৫]

কবি বলেন, -

"নতুন রাত্রির সাথে পৃথিবীর বিবাহের গান!
ফসল উঠিছে ফ'লে, — রসে রসে ভরিছে শিকড়;
লক্ষ নক্ষত্রের সাথে কথা কয় পৃথিবীর প্রাণ!"

('জীবন', *ধূসর পাণ্ডুলিপি*)

কবিতায় কবি অ্যাসিড, ডিএনএ, আরএনএ না বলে, বলেছেন, রসে রসে ভরেছে শিকড়। অন্ধকারে এসবের মিশ্রণ যেন বাসর ঘরের মত কবির কাছে; তাই নতুন রাত্রির সাথে পৃথিবীর বিবাহ।

প্রাণের সূচনালগ্ন, আর্কিয়ান মহাকাল মোট চারটি ধাপে বিভক্ত।

১. ইওআর্কিয়ান (৪০০—৩৬০ কোটি বছর পূর্বে)
২. প্যালিওআর্কিয়ান (৩৬০—৩২০ কোটি বছর পূর্বে)
৩. মেজোআর্কিয়ান (৩২০—২৮০ কোটি বছর পূর্বে)
৪. নিওআর্কিয়ান (২৮০—২৫০ কোটি বছর পূর্বে)

ইওআর্কিয়ান কালের ৪০ কোটি বছরে প্রাণের উদ্ভব। প্যালিওআর্কিয়ান কালে প্রাণে বিবর্তন দেখা দেয়। ইউব্যাকটেরিয়া, সায়ানোব্যাকটেরিয়া, স্ট্রোমোটোলাইট, বেগুনী ব্যাকটেরিয়া প্রভৃতি বিভাজন দেখা দেয় প্রাণে। সায়ানোব্যাকটেরিয়া সালোকসংশ্লেষণের করে পৃথিবীতে অক্সিজেন উৎপন্ন করতে শুরু করে। প্যালিওআর্কিয়ান কালের বিবর্তনের ধারাবাহিকতা মেজোআর্কিয়ান কালেও চলতে তাকে। এ কালের প্রাণীরা ছিল অক্সিজেন বিরাগী।

> "নিওআর্কিয়ান কালে আজকের দিনের বড় মহাদেশগুলির জন্ম হয়। সায়ানোব্যাটেরিয়ারা বর্ধিত মাত্রায় অক্সিজেন উৎপাদন করতে থাকে।"[৬]

আর্কিয়ান মহাকালে ব্যাকটেরিয়া পর্যন্তই প্রাণের অগ্রগতি হয়। এরপর প্রোটেরোজোইক মহাকালে প্রাণের আরো উন্নতি ঘটে।

প্রোটোরেজোইক মহাকাল ২৫০-৫৪ কোটি বছর পূর্ব পর্যন্ত বিস্তৃত। প্রাণের অগ্রগতির নিরিখে একে তিনটি কালে ভাগ করা হয় -

১. প্যালিওপ্রোটেরোজোইক কাল
২. মেজোপ্রোটেরোজোইক কাল
৩. নিওপ্রোটেরোজোইক কাল

এ দীর্ঘ সময়ে প্রাণের বিবর্তন জটিল থেকে জটিলতর হতে থাকে। প্রারম্ভিক অক্সিজেন বিরাগী প্রাণ থেকে

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 47
Website: https://tirj.org.in, Page No. 423 - 434
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

অক্সিজেনগ্রাহী প্রাণে রূপান্তর ঘটতে থাকে। প্রোটেরোজোইক মহাকালের শেষের দিকে নিওপ্রোটেরোজোইক কালে কোষকেন্দ্রহীন প্রাণ থেকে প্রধানত কোষকেন্দ্রযুক্ত প্রাণ, এককোষী থেকে বহুকোষী প্রাণ এবং জটিল থেকে জটিলতর প্রাণের উদ্ভব ঘটতে থাকে।[৭] ব্যাকটেরিয়া থেকে প্রাণ অ্যামিবায় রূপান্তরিত হয় এ প্রোটেরোজোইক মহাকালে। কবি বলেন,

"পৃথিবীকে ধাত্রীবিদ্যা শিখায়েছে যারা বহুদিন
সেই সব আদি অ্যামিবারা আজ পরিহাসে হয়েছে বিলীন।
গূর্যসাগরতীরে তবুও জননী ব'লে সন্তুতিরা চিনে নেবে কারে।"

('মনোসরণি', *সাতটি তারার তিমির*)

আজ আর অ্যামিবারা নেই, কালের পরিহাসে বিলীন হয়ে গেছে। কিন্তু পৃথিবীতে প্রাণের অগ্রগতিতে তারা জননীর মতই ভূমিকা রেখেছে। পৃথিবীকে তারা ধাত্রীবিদ্যা শিখিয়েছে প্রায় দুইশ কোটি বছর যাবৎ।

ফ্যানেরোজোইক মহাকালে প্রাণ অ্যামিবা থেকে দৃশ্যমান প্রাণীতে উন্নতি লাভ করে। এ ক্রমোন্নোতি অনুসারে মহাকালকে তিনটি কালে ভাগ করা হয়।

১. প্যালিওজোইক কাল
২. মেজোজোইক কাল
৩. সেনোজোইক কাল

প্যালিওজোইক কাল আবার ৬টি যুগে বিভক্ত।

১. ক্যাম্ব্রিয়ান যুগ (৫৪-৪৮ কোটি বছর)
২. অর্ডোভিসিয়ান যুগ (৪৮-৪৪ কোটি বছর)
৩. সিলুরিয়ান যুগ (৪৪-৪১ কোটি বছর)
৪. ডেভোনিয়ান যুগ (৪১-৩৫ কোটি বছর)
৫. কার্বনিফেরাস যুগ (৩৫-২৯ কোটি বছর)
৬. পার্মিয়ান যুগ (২৯-২৫ কোটি বছর)

ক্যাম্ব্রিয়ান যুগ প্রাণের ইতিহাসে একটি রোমান্টিক যুগ। এ যুগে প্রাণ দৃশ্যমান জীবে রূপ ধারণ করতে সক্ষম হয়। কবি বলেন, -

"সে কোন্ প্রথম ভোরে পৃথিবীতে ছিল যে সন্তান
অঙ্কুরের মতো আজ জেগেছে সে জীবনের বেগে!
আমার দেহের গন্ধে পাই তার শরীরের ঘ্রাণ, —
সিন্ধুর ফেনার গন্ধ আমার শরীরে আছে লেগে!"

('জীবন', *ধূসর পাণ্ডুলিপি*)

এ সময় প্রাণ ছিল কেবল জলে। স্থলভাগ ছিল শুষ্ক উষর মরুভূমি। সেখানে কোন প্রাণের ছোঁয়া ছিল না। জলে প্রাণের ব্যাপক সমৃদ্ধি ঘটে। কবি সেকালে জীব রূপে সমুদ্রে বিদ্যমান ছিলেন। নিজের দেহে কবি আজও সেকালের জীবদেহের ঘ্রাণ অনুভব করেন। কবি সেকালে সমুদ্রে বাস করতেন এবং আজও যেন শরীরে সেকালের সমুদ্রের ফেনার গন্ধ লেগে আছে। প্রাণের বিবর্তনের ধারায় ক্যাম্ব্রিয়ান যুগ একটি বিপ্লব। "ক্যাম্ব্রিয়ান যুগে অতি সাধারণ প্রাণরূপ ছিল হরেক রকমের ট্রাইলোবাইট। ৫৩ কোটি বছর আগে ক্যাম্ব্রিয়ান যুগে, প্রথম শক্ত খোলসের প্রাণীদের দেখা যায়। সন্ধিপদ গোত্রের বর্তমানে বিলুপ্ত প্রাণী ট্রাইলোবাইট। আরো ছিল প্রথম 'ক্রাস্টাশিয়ান' অর্থাৎ সন্ধিপদ চিংড়ি কাঁকড়া উপগোত্র ও মোলাস্ক অর্থাৎ স্কুইড, অক্টোপাস থেকে শামুক, ঝিনুক পর্যন্ত জলজ প্রাণীরা।[৮] কবির উপলব্ধি –

"একদিন এ জীবন সত্য ছিলো শিশিরের মতো স্বচ্ছতায়;
কোনো নীল নতুন সাগরে
ছিলাম— তুমিও ছিলে ঝিনুকের ঘরে

সেই জোড়া মুক্তো মিথ্যে বন্দরে বিকিয়ে গেল হায়।”

('রাত্রি দিন', *শ্রেষ্ঠ কবিতা*)

সাগরে যখন প্রাণ শামুক, ঝিনুক হয়ে জন্মেছিল তখন কবি ও কবির প্রিয়া এক ঝিনুক মাতার ঘরে জোড়া মুক্তা হয়ে বিরাজিত ছিলেন।

অর্ডোভিসিয়ান যুগে স্থলভাগে প্রথম উদ্ভিদের অভিযোজন ঘটে। এগুলি ছিল কাণ্ড ছাড়া ছত্রাক ও শেওলা জাতীয়। সিলুরিয়ান যুগে বড় বড় বৃক্ষ সমস্ত স্থলভাগ ছেয়ে ফেলে। ডেভোনিয়ান যুগে বীজ সম্পন্ন উদ্ভিদ বা সত্যিকারের বৃক্ষের আবির্ভাব ঘটে। সারা পৃথিবী গভীর অরণ্যে ঢেকে যায়।

'মনোসরণি' কবিতায় কবি অতিসংক্ষেপে আধুনিক মানুষ থেকে ক্রমে নানা ধাপ বর্ণনা করে অ্যামিবা পর্যন্ত পৌঁছেছেন। সেখানে এক অংশে অরণ্য জীবনের কথা রয়েছে। কবি বলেন, -

“হয়তো বা—
ফলেছিলো সৃষ্টির আগাগোড়া শপথ হারিয়ে,
যে বাতাস সারাদিন খেলা করে অরণ্যের রঙে,
যে বনানী সুর পায়, —”

('মনোসরণি', *সাতটি তারার তিমির*)

ডেভোনিয়ান যুগের এ অরণ্যময় পৃথিবীতে প্রথম স্থলভাগে প্রাণীর আবির্ভাব ঘটে। সার্কপ্টেরিজিয়ান মাছই হল প্রথম স্থলভাগে অভিযোজনকারী প্রাণী। জাহিদ মনজুর বলেন, -

“'সর্কপ্টেরেজিয়ান' গোত্রের মাংসল বিভক্ত পাখ্না যুক্ত পাঁচ আঙ্গুল বিশিষ্ট উপকূলীয় ফুসফুসধারী কোনো টেট্রাপড বা প্রাথমিক চতুষ্পদ প্রাণী বা অগ্রসর মাছ থেকে প্রথমে উভয়চর এবং পরে স্থলভাগের সমস্ত মরুদণ্ডী চতুষ্পদ প্রাণীর বিবর্তন হয়েছে।”[৯]

স্থলভাগে প্রাণের আগমনকে কবি স্বাগতম জানিয়েছেন।

“যেখানে গাছের শাখা নড়ে
শীতরাতে, —মড়ার হাতের শাদা হাড়ের মতন!
যেইখানে বন
আদিম রাত্রির ঘ্রাণ
বুকে লয়ে অন্ধকার গাহিতেছে গান! —
তুমি সেইখানে!
নিঃসঙ্গ বুকের গানে
নিশীথের বাতাসের মতো
একদিন এসেছিলে, —”

('সহজ', *ধূসর পাণ্ডুলিপি*)

গভীর অন্ধকার অরণ্যে প্রাণ অতিসন্তর্পণে, ভীরুপদে, বিবর্তনের ধীর পথ ধরে নিশীথের বাতাসের মত একদিন এসেছিল। সে থেকে স্থলভাগে জীবের সূচনা। কবি সেদিনের বন্দনায় মুখর।

ডেভোনিয়ান যুগে পোকামাকড়েরও ব্যাপক বিকাশ ঘটে। জাহিদ মনজুর বলেন, -

“ঐ উদ্ভিদ, মাটি আর পোকা মাকড় মিলে ডেভোনিয়ান যুগের শেষের দিকে স্থলভাগে স্থলচর মেরুদণ্ডী প্রাণীর বসবাসের উপযুক্ত প্রাচুর্যময় পরিবেশ গড়ে তুলেছিল।”[১০]

কার্বনিফেরাস যুগে বাতাসে অক্সিজেনের আধিক্যের দরুন পোকামাকড়ের আকার দানবাকৃতির হয়ে ওঠে। পার্মিয়ান যুগের ৯০ ভাগ প্রাণী ছিল আরশোলা জাতীয়। উড়ন্ত পতঙ্গের মধ্যে ছিল প্রায় ২ ফুট লম্বা ফড়িং। এ সময় গোবরে পোকা ও মাছির আবির্ভাব ঘটে। কবি বলেন, -

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 47
Website: https://tirj.org.in, Page No. 423 - 434
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

"সূর্যের সোনালি রশ্মি, বোলতার স্ফটিক পাখনা,
মরুভূর দেশে যেই তৃণগুচ্ছ বালির ভিতরে
আমাদের তামাশার প্রগলভতা হেঁট শিরে মেনে নিয়ে চুপে,
তবু দুই দণ্ড এই মৃত্তিকার আড়ম্বর অনুভব করে,"

('মনোসরণি', *সাতটি তারার তিমির*)

প্রাণের বিবর্তন ধারায় প্যালিওজোইকের পর মেজোজোইক কাল। এ কাল তিনটি যুগে বিভক্ত।

১. ট্রায়াসিক যুগ (২৫—২০ কোটি বছর)
২. জুরাসিক যুগ (২০—১৪ কোটি বছর)
৩. ক্রেটাশাস যুগ (১৪—৬.৬ কোটি বছর)

পার্মিয়ান যুগের ব্যাপক গণবিলুপ্তির পর ট্রায়াসিক যুগে স্তন্যপায়ী প্রাণীদের পূর্বপুরুষের আবির্ভাব ঘটে। প্রাণীজগতে এটি একটি বড় অগ্রগতি। জুরসিক যুগ ডাইনোসরের যুগ। এ যুগে ডাইনোসরেরা সারা পৃথিবী দাপিয়ে বেড়াতো। বিভিন্ন প্রজাতির ডাইনোসর ছিল তখনকার যুগের প্রধান প্রাণী : থেরোপডা (জন্তু পা, দ্বীপদ, মাংসাশী), সরোপডোমর্ফা (টিকটিকি পা ও শরীর, উদ্ভিদভোজী, ছোট মাথা, লম্বা গলা, লম্বা লেজ), অ্যাঙ্কাইলোসরিয়া (আঁশটে হাড়ের বর্মাবৃত, কারো বা মুগুরের মত লেজ), স্টেগোসরিয়া (কাঁটা ও আঁশের মত বর্মাবৃত), আর্নিথোপডা (দ্বীপদ ও চতুষ্পদ, অনেক দাঁত ও খুলির নমনীয়তার সাহায্যে চিবানোর একটা পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছে)। যাইহোক ডাইনোসরের আবির্ভাব প্রাণীজগতের এক রোমান্টিক অগ্রগতি। প্রাণীদের অনেক বৈশিষ্ট্য ডাইনোসরের দান। ক্রেটাশাস যুগের মৃত্যুর ঠিক আগে আগে ডাইনোসরদের মধ্যে ব্যাপক বিবর্তন ঘটে যা প্রাণীকে অনেক অগ্রগতি দেয়। এই সময়েই আমরা প্রথম বারের মত অনেক পতঙ্গ গোষ্ঠী; আধুনিক স্তন্যপায়ী গোত্র, পাখি এবং সপুষ্পক উদ্ভিদের জীবাশ্মের সাক্ষাৎ পাই।[১১]

এ যুগে পাখিদের অবির্ভাব ঘটে। জাহিদ মনজুর বলেন, -

"জুরাসিক যুগের আর এক উল্লেখযোগ্য বিবর্তন সংক্রান্ত ঘটনা হল সিলুরোসরিয়ান শাখার ম্যানিরেপ্টোরান গোত্রের ডাইনোসর থেকে সত্যিকার পাখিদের উদ্ভব হওয়া।"[১২]

অমল দাস গুপ্তের মন্তব্যও এ ব্যাপারে প্রণিধান যোগ্য। তিনি বলেন, -

"পৃথিবীর প্রথম পাখিও এই জুরাসিক কালেই। উড়ন্ত সরীসৃপ নয়, পাখি। আমরা আগে বলেছি, সরীসৃপ থেকে পাখিরা এসেছে।"[১৩]

'মনোসরণি' কবিতায় প্রাণের ধারাবাহিকতায় পাখি জীবনের প্রতীক হয়ে এসেছে সারস দম্পতির চিত্রকল্প। কবির ভাষায়-

"তবু দুই দণ্ড এই মৃত্তিকার আড়ম্বর অনুভব করে,
যে সারস—দম্পতির চোখে তীক্ষ্ণ ইস্পাতের মতো নদী এসে
ক্ষণস্থায়ী প্রতিবিম্বে—"

('মনোসরণি', *সাতটি তারার তিমির*)

ক্রেটাশাস যুগে ৬.৬ কোটি বছর আগে ডাইনোসরের বিলুপ্তি ঘটে। পৃথিবীর বাহির থেকে ১০-১৫ কি. মি. চওড়া একটি গ্রহাণু মেক্সিকোর ইউকাটান উপদ্বীপে এসে আছড়ে পড়ে। এতে ভূপৃষ্ঠের অধিকাংশ অংশে দাবানল সৃষ্টি হয়। গাছপালা পুড়ে গিয়ে ব্যাপক কার্বনডাইঅক্সাইড উৎপন্ন হয় যা বায়ুমণ্ডলকে উত্তপ্ত করে তোলে। প্রবল তাপ ও খাদ্যের অভাবে ডাইনোসরেরা মৃত্যুবরণ করে। দক্ষিণ আমেরিকার মরুভূমিতে, অস্ট্রেলিয়ায়, ভারতে, চীনে ডাইনোসরের বহু জীবাশ্ম আবিষ্কৃত হয়েছে। কবি সেই দিনের সে পরিস্থিতিকে নান্দনিক রূপ দিয়েছেন 'মরুবালু' কবিতায়। আজকের দিনে ডাইনোসরের ফসিল পাওয়া যায় বিভিন্ন মরুভূমিতে। তাদের সদর্প বিচরণ ও বিপর্যয় দুয়ের সম্মিলন ঘটেছে 'মরুবালু' কবিতার একটি চিত্রকল্পে।

"তোদের সনে 'ডাইনোসুরে'র লড়াই হলো কত, —
আলুথালু লুটিয়ে বালুর ডাইনী ছায়ার তলে

আজকে তারা ঘুমিয়ে আছে, — চুল্লি শত শত
উঠলো জ্বলে তাদের হাড়ে, তাদের নাড়ের বলে;
কাঁদছে খাঁ খাঁ কাফন — ঢাকা বালুর চাকার নিচে
মণ্ডু তাদের, — মড়ার কপাল ভৈরবেরি গলে!"

('মরুবালু', *ঝরা পালক*)

ক্রেটাশাস গণবিলুপ্তির পর সেনোজোইক কালের প্যালিওজিন যুগে প্রাণ আবার নতুন করে জেগে ওঠে। বিজ্ঞানীরা বলেন, -

"পাখি আর স্তন্যপায়ীর মত প্রাণীরা উদ্ভিদ নির্ভর খাদ্যচক্র ধ্বংস হওয়া সত্বেও বেঁচে গিয়েছিল কারণ তারা পঁচাগলা খেতে পারতো!"[১৪]

মানুষের ইতিহাসের সূচনা হয় এ কালে। এ সময়কে সেনোজোইক বা নতুন প্রাণের কাল বলা হয়। সেনোজোইক কাল তিনটি যুগে বিভক্ত।

১. প্যালিওজিন যুগ
২. নিওজিন যুগ
৩. কুয়ার্টানারি যুগ

প্যালিওজিন যুগকে আবার তিনটি পর্বে ভাগ করা হয়।

১. প্যালিওসিন পর্ব (৬.৬-৫.৬ কোটি বছর)
২. ইওসিন পর্ব (৫.৬-৩.৩৯ কোটি বছর)
৩. অলিগোসিন পর্ব (৩.৩৯-৩.৩০ কোটি বছর)

প্যালিওসিন পর্বে প্রথম স্তন্যপায়ী প্রাইমেট এর আবির্ভাব ঘটে। এরা এপ, বানর, মানুষের পূর্বপুরুষ। এরা স্তন্যপায়ী ছিল। যদিও প্রথম স্তন্যপায়ী নয়। স্তন্যপায়ী প্রাণীদের প্রথম আবির্ভাব হয় ট্রায়াসিক যুগে ২৫-২০ কোটি বছর আগে। এ পর্বে এসে এরা প্রাইমেটে উন্নীত হয়। জাহিদ মনজুর বলেন, -

"কাঠবিড়ালীর মত ২.১ কেজি ওজনের প্লেসিয়াড্যাপিস ছিল একেবারে প্রাথমিক পর্যায়ের ক্ষুদ্রতিক্ষুদ্র 'প্রাইমেট' যাদের থেকে শেষ পর্যন্ত হোমো স্যাপিয়েন্স বা আধুনিক মানুষের উদ্ভব হয়েছে।"[১৫]

ইওসিন পর্বে প্রাইমেটের আরেকটু উন্নতি ঘটে। এদের নাম ইওসিমিয়া।

"ইওসিমিয়া ছিল মানুষ ও বানরের পূর্বপুরুষ প্রারম্ভিক প্রাইমেট।"[১৬]

অলিগোসিন পর্বে এসে ইওসিমিয়া মানুষের আকার ধারণ করতে থাকে।

"আড়াই কোটি বছর আগে অলিগোসীন পর্বে বনমানুষ-মানুষ ধারার বিবর্তন শুরু হয়। এরা ছিল হোমিনয়েড প্রাইমেট। হোমিনয়েড প্রাইমেটদের থেকে মানুষের পূর্বপুরুষ এবং বৃহৎ-বনমানুষের ধারা যথা: শিম্পাঞ্জী, গরিলা আর ওরাংওটাং, এবং ক্ষুদ্র-বনমানুষের ধারা যথা: গিবন ও সিয়াম্যাং ইত্যদির উদ্ভব হয়।"[১৭]

অমল দাস গুপ্ত বলেন, -

"উচ্চতর প্রাইমেটদেও মধ্যে আছে তিনটি বড়ো দল : নতুন জগতের বানর, পুরনো জগতের বানর ও হমিনয়েড (এপ্ ও মানুষ)।"[১৮]

একটি দুর্বল অবস্থা থেকে তারা ধীরে ধীরে হোমিনিয়েড অর্থাৎ বন মানুষের পর্যায়ে এসে পৌঁছে। মানুষের এ প্রারম্ভিক পর্ব সম্পর্কে কবির অভিমত -

"গাঢ় অন্ধকার থেকে আমরা এ পৃথিবীর আজকের মুহূর্তে এসেছি।
বীজের ভিতর থেকে কী ক'রে অরণ্য জন্ম নেয়, —
জলের কণার থেকে জেগে ওঠে নভোনীল মহান সাগর,

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 47
Website: https://tirj.org.in, Page No. 423 - 434
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

কী ক'রে এ প্রকৃতিতে— পৃথিবীতে, আহা
ছায়াচ্ছন্ন দৃষ্টি নিয়ে মানব প্রথম এসেছিল,
আমরা জেনেছি সব— অনুভব করেছি সকলি।"

('অন্ধকার থেকে', *বেলা অবেলা কালবেলা*)

প্রাইমেট থেকে মানুষের বিবর্তনকে কবি মানুষের ছায়াচ্ছন্ন অসহায় অবস্থা হিসেবে দেখেছেন। কারণ প্রকৃতির কোলে মানুষ তখন ছিল খুবই অসহায়। এ নতুন প্রাণের নিওজিন যুগ দুটি পর্বে বিভক্ত।

১. মায়োসিন (২ কোটি ৩০ লক্ষ ৩০ হাজার - ৫৩ লক্ষ ৩৩ হাজার বছর)

২. প্লায়োসিন (৫৩ লক্ষ ৩৩ হাজার - ২৫ লক্ষ ৮৮ হাজার বছর)

মায়োসিন পর্বে মানুষের বিকাশ চোখে পড়ার মত। "মায়োসীন পর্বে আফ্রিকায় আর ইউরেশিয়ায় হরেক রকম হোমিনিড প্রজাতির বসবাস ছিল।"[১৯] প্লায়োসিন পর্বে মানুষ আরো উন্নত হয়। "প্লায়োসীন পর্বে মানুষের পূর্বপুরুষসহ সব হোমিনিডরা আফ্রিকায় গিয়ে জড়ো হয়।"[২০]

কবি তখনকার মানুষের এ অবস্থায় বেশ প্রফুল্ল। তার ভাষায় -

"—শিশু মানব গড়েছিল ঐ সাহারায় বাসা;
—সে সব গেছে কবে ঘুমের চুমার ধোঁয়ায় ধূমি!
অটল আকাশ যাচ্ছে জরির ফিতার মতো ফেঁড়ে,
জবান তোদের জলছে যমের চিতার গেলাস চুমি!"

('মরুবালু', *ঝরা পালক*)

মানুষের উদ্ভবের এ তত্ত্ব প্রচলিত ধর্মমতের তত্ত্বকে জরির ফিতার মতই ছিঁড়ে ফেলেছে। মরুভূমিতে মানুষের ফসিল যেন জবান খুলে কথা বলতে পারছে, যে তারা এক সময় পৃথিবীতে ছিল।

সর্বশেষ কোয়ার্টানারি যুগ দুটি পর্বে বিভক্ত।

১. প্লিস্টোসিন (২৫ লক্ষ ৮৮ হাজার - ১১ হাজার ৭ শত বছর)

২. হলোসিন (১১ হাজার ৭ শত-বর্তমান)

"প্লিস্টোসিন পর্বেই হোমিনিড পূর্বপুরুষ থেকে স্বতন্ত্র প্রজাতি হিসেবে হোমো স্যাপিয়েন্স বা আধুনিক মানুষের উদ্ভব হয়েছিল।"[২১]

হোমা স্যাপিয়েন্স রূপে আত্মপ্রকাশ করার পূর্বে তাদের বেশ কয়েকেটি প্রজাতি ধাপে ধাপে অগ্রসর হয়েছিল। আফ্রিকা মহাদেশে মানব প্রজাতির মেলা বসেছিল। কবিও বার বার মানুষের উদ্ভবের কৃতিত্ব আফ্রিকাকেই দিতে চেয়েছেন। আফ্রিকা মহাদেশেই মানুষ কোটি কোটি বছরে বিবর্তিত হয় এবং সেখান থেকে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে। এ বিবর্তনের একটি রূপরেখা নিম্নরূপ -

প্যারাপিথেকাস : "মিসরের ফায়ুম মরু এলাকা থেকে প্রায় সাড়ে চার কোটি বছর আগেকার একটি প্রাণীর নিচের চোয়ালের হাড় ও দাঁতের ফসিল (পাথরে পরিণত অবস্থা) পাওয়া গেছে। ...এদের প্যারাপিথেকাস নাম দেয়া হয়েছে।"[২২]

অমল দাস গুপ্ত বলেন, - "অলিগোসিন সময়ে (প্রায় চার কোটি বছর আগে) পুরনো জগতে প্রাইমেটের সাক্ষাৎ পাওয়া গিয়েছে মিশর থেকে। মিশেও তখন ট্রপিক্যাল আবহাওয়া, প্রচুর বৃষ্টিপাত ও ঘন অরণ্য।"[২৩]

প্রোপ্লায়োপিথেকাস : "এরা মিসরের ফায়ুম এলাাকাতেই চার থেকে সাড়ে তিন কোটি বছর আগে বাস করতো।"[২৪]

প্লায়োপিথেকাস : আফ্রিকা, এশিয়া, ইউরোপসহ সারা পৃথিবীতেই এদের ফসিল আবিষ্কৃত হয়েছে।

প্রোকন্সাল : প্রায় দুই কোটি বছর আগে প্রোকন্সালরা পৃথিবীতে বাস করতো। "১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে আফ্রিকার কেনিয়া থেকে প্রোকন্সালের ফসিল প্রথম আবিষ্কৃত হয়েছিল।"[২৫]

রামাপিথেকাস : রামাপিথেকাসদের ফসিল প্রথম হিমালয়ের শিবালিক পাহাড়ে পাওয়া যায়। "১৯৬১ খ্রিস্টাব্দে আফ্রিকার দেশ কেনিয়ায় ফোর্ট টের্নানে আগ্নেয়গিরির ছাইয়ের নিচ থেকে যে রামাপিথেকাসের ফসিল পাওয়া গেছে তার বয়স ১

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 47
Website: https://tirj.org.in, Page No. 423 - 434
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

কোটি ৪০ লাখ বছর।"[২৬]

জিনজানথ্রপাস : "আফ্রিকার টাঙ্গানিকার ওলদোভাই গিরিখাদ থেকে লুই লিকি ও মেরি লিকি ১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দের ১৭ জুলাই প্রথম জিনজানথ্রপাসের ফসিল আবিষ্কার করেছিলেন।"[২৭] অস্ট্রালোপিথেকাস আফ্রিকানাস : অস্ট্রালোপিথেকাসের সাথে মানুষের চেহারার মিল খুবই কাছাকাছি পর্যায়ের। এরা ৪০ লক্ষ বছর আগে পৃথিবীতে বাস করতো। "প্রথমবারের মতো অস্ট্রালোপিথেকাসের ফসিল আবিষ্কৃত হয়েছিল দক্ষিণআফ্রিকা থেকে।"[২৮] অস্ট্রালোপিথেকাস রোবাসটাস, অস্ট্রালোপিথেকাস বয়জাই আফ্রিকাতেই আবিষ্কৃত হয়। ২০ লক্ষ থেকে ১৫ লক্ষ বছর আগের সময়ের মধ্যে দেখা দিয়ে বিলুপ্ত হয়েছে এরা।[২৯] ডোনাল্ড জোহানসন এর মতে, অস্ট্রালোপিথেকাস হোমো হাবিলিসের পূর্বপুরুষ। হোমো হাবিলিস থেকে হোমো ইরেক্টাস এবং হোমো ইরেক্টাস থেকে হোমো স্যাপিয়েন্স এর উৎপত্তি।[৩০]

হোমো হাবিলিস : এরা প্রস্তর যুগের মানুষ। "১৯৬০ সালের ওলদোভাই (আফ্রিকা) এলাকা থেকে প্রথম এদের ফসিল আবিষ্কৃত হয়েছিল।"[৩১] এরা বুদ্ধিমান ছিল। অস্ট্রালোপিথেকাস থেকে এরা মানুষের অনেকটা নিকটতর। বিজ্ঞানী লুই লিকি বলেন, "রামাপিথেকাস আর আধুনিক বুদ্ধিমান মানুষের মধ্যবর্তী প্রাণীটিই হলো হোমো হাবিলিস।"[৩২]

হোমো ইরেক্টাস : এরা খাড়া মানুষ। সম্পূর্ণ সোজা হয়ে দাঁড়াতে শিখে। সারা পৃথিবীতে এদের বিচরণ থাকলেও "আদিতে এরা আফ্রিকার বাসিন্দা ছিল।"[৩৩] এরা জাভা মানব হিসেবেও পরিচিত। ১৭ লক্ষ বছর আগে এরা পৃথিবীতে বর্তমান ছিল।[৩৪]

নিয়ন্ডারথাল মানব : এরা আধুনিক মানুষ হোমো স্যাপিয়েন্স এর বেশ কাছাকাছি। "আফ্রিকা ইউরোপ ও এশিয়া থেকে নিয়ন্ডারথালের বহু ফসিল আবিষ্কৃত হয়েছে।"[৩৫] এরা পুরাপ্রস্তর যুগের মানুষ। পাথরের ছুরি, রেঁদা, বাটালি প্রভৃতির ব্যবহার এদের আয়ত্বে ছিল।

উপযুক্ত আলোচনায় দেখা যায় আফ্রিকা মহাদেশেই মানুষ উন্নত থেকে উন্নততর প্রজাতিতে রূপান্তরিত হয়েছে। অর্থাৎ মানুষের বিবর্তন ধারার একটি প্রতিষ্ঠান হল আফ্রিকা মহাদেশ। কবি সেজন্য মানুষের উৎপত্তির সকল যশ আফ্রিকাকে দিয়েছেন।

> "অনাদি যুগের অ্যামিবার থেকে আজিকে মানব প্রাণ,
> গড়িয়া উঠিল কাফ্রির মতো সূর্যসাগরতীরে
> কালো চামড়ার রহস্যময় ঠাশবুননিটি ঘিরে।"
>
> ('সুর্যসাগর তীরে', *মহাপৃথিবী*)

কবির মতে, কাল চামড়ার আফ্রিকাবাসীই অ্যামিবা থেকে বিবর্তনের মাধ্যমে মানুষ রূপ লাভ করে। তাই বিবর্তনের ইতিহাসে আফ্রিকা হল মানুষের আঁতুড় ঘর। কবি আফ্রিকার নারীদেরকে কৃষ্ণ জননী বলে সম্বোধন করেছেন।

> "সূর্য সাগরতীরে মানুষের তীক্ষ্ম ইতিহাসে
> কত কৃষ্ণ জননীর মৃত্যু হ'ল রক্তে— উপেক্ষায়;
> বুকের সন্তান তবু নবীন সংকল্পে আজো আসে।"
>
> ('মনোসরণি', *সাতটি তারার তিমির*)

বন্যদশা মানুষের জীবনের প্রাথমিক দিক। এ সময় মানুষ কুড়িয়ে খেত। পরে তারা শিকার করতে শিখে। এক সময় পাথরকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে। তখনকার সময়কে ঐতিহাসিকেরা প্রস্তরযুগ নামে অভিহিত করেন। প্রস্তর যুগ তিনটি ভাগে বিভক্ত।

১. পুরাপ্রস্তর যুগ
২. মধ্যপ্রস্তর যুগ
৩. নব্যপ্রস্তর যুগ

কবি প্রস্তর যুগের ঘোড়ার খুরধ্বনি শুনতে পান পৃথিবীর মাঠে। মহীনের ঘোড়াগুলোর সাথে যেন তারাও ঘাস খায়।

"প্রস্তরযুগের সব ঘোড়া যেন এখনো ঘাসের লোভে চরে
পৃথিবীর কিমাকার ডাইনামোর 'পরে।
… … …
প্যারাফিন— লণ্ঠন নিভে গেলে গোল আস্তাবলে
সময়ের প্রশান্তির ফুঁয়ে;
এইসব ঘোড়াদের নিওলিথ— স্তব্ধতার জ্যোৎস্নাকে ছুঁয়ে।"

('ঘোড়া', *সাতটি তারার তিমির*)

মানব সমাজের বিবর্তন ধারায় মানুষ এক সময় সভ্য সমাজ গড়ে তোলে। পাথরের পর আসে ধাতব যুগ। উদ্ভব হয় নগর, রাষ্ট্র। ক্রমে জ্ঞান, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি এসে মানুষকে পৃথিবীর একচ্ছত্র আধিপত্য প্রদান করে।

নানা চড়াই উৎরাই পার হয়ে মানুষ আজকের অবস্থানে পৌঁছেছে। জীবনান্দ দাশ একজন বিবর্তনবাদী চিন্তাবিদ। মানুষের উদ্ভবের পিছনে কোন ঈশ্বরের ইচ্ছা, উদ্দেশ্য ও হস্তক্ষেপ নেই। প্রাণের বিবর্তন ধারায় মানুষ উৎকৃষ্ট প্রাণী। জীবনানন্দ দাশ তার কাব্যসমগ্রে প্রাণের উদ্ভবের শুরু থেকে ধাপে ধাপে বর্তমান অবস্থা পর্যন্ত আলোকপাত করেছেন। সমুদ্রের জলে ব্যাকটেরিয়া রূপে প্রাণের উদ্ভব। পরের স্তরে অ্যামিবা রূপে উন্নতি লাভ করে। এরপর ক্রমান্বয়ে জীবের আকৃতি ধারণ, উদ্ভিদ জীবন, পতঙ্গ, পাখি, পশুজীবন তারপর ছায়চ্ছন্ন দৃষ্টি নিয়ে মানব জীবনের ঊষাকাল, আফ্রিকায় কৃষ্ণ জননীর কোলে মানুষ হিসেবে জন্ম নেয় প্রাণ। মানব জীবনে বন্যযুগ, প্রস্তরযুগ পার করে সমাজবদ্ধ সভ্য জীবনে প্রবেশ পর্যন্ত তার নানা কবিতায়, স্তবকে, বাক্যে কখনো বড় আকারে, কখনো শুধু ব্যঞ্জনায় উপস্থাপন করেছেন। উপমা, উৎপ্রেক্ষা, রূপক, চিত্রকল্প প্রভৃতি অসংখ্য অলংকারের গাঁথুনিতে বিবর্তনবাদ সরস সুষমা পেয়েছে। বিবর্তনবাদকে তিনি নন্দনতত্ত্বের শাখা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছেন। পূর্বে এ স্থানে ছিল সৃষ্টিতত্ত্ব। বাংলা সাহিত্যে এ ধারাটিকে বিজ্ঞানের অধিকারে আনেন জীবনানন্দ দাশ। সৃষ্টিতত্ত্বকে উদ্ভবতত্ত্বে রূপান্তর করে জীবনানন্দ দাশ সাহিত্যকে মধ্যযুগীয় কুসংসংস্কারাচ্ছন্ন চিন্তা থেকে উদ্ধার করেছেন।

Reference:

১. ইসলাম, ড. আমিনুল, *পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস,* মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০০৯, পৃ. ২১০
২. তদেব, পৃ. ২১২
৩. মনজুর, ডা. জাহিদ, *প্রকৃতি ও মানুষের ক্রমবিকাশ,* রোদেলা, ঢাকা, ২০১৮, পৃ. ১৫৮
৪. দাসগুপ্ত, অমল, *প্রাণের ইতিবৃত্ত,* হাওলাদার প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৪, পৃ. ৩২
৫. তদেব, পৃ. ৩৫
৬. মনজুর, ডা. জাহিদ, পূবোর্ক্ত, পৃ. ১৭০
৭. তদেব, পৃ. ১৭২
৮. তদেব, পৃ. ১৯৪
৯. তদেব, পৃ. ২০৩
১০. তদেব, পৃ. ২০৪
১১. তদেব, পৃ. ২৪২
১২. তদেব, পৃ. ২২৮
১৩. দাসগুপ্ত, অমল, পূবোর্ক্ত, পৃ. ১২৪
১৪. মনজুর, ডা. জাহিদ, পূবোর্ক্ত, পৃ. ২৪৬
১৫. তদেব, পৃ. ২৫৫
১৬. তদেব, পৃ. ২৫৭

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 47
Website: https://tirj.org.in, Page No. 423 - 434
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

১৭. তদেব, পৃ. ২৬১
১৮. দাসগুপ্ত, অমল, পূবোর্ক্ত, পৃ. ১৭১
১৯. মনজুর, ডা. জাহিদ, পূবোর্ক্ত, পৃ. ২৬৬
২০. তদেব, পৃ. ২৬৬
২১. তদেব, পৃ. ২৭৪
২২. হাসান, খন্দকার মাহমুদুল, *যেমন করে মানুষ এলো,* কথাপ্রকাশ, ঢাকা, ২০১৭, পৃ. ৭৮
২৩. দাসগুপ্ত, অমল, পূবোর্ক্ত, পৃ. ১৭১
২৪. হাসান, খন্দকার মাহমুদুল, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৯
২৫. তদেব, পৃ. ৮০
২৬. তদেব, পৃ. ৮১
২৭. তদেব, পৃ. ৮২
২৮. তদেব, পৃ. ৮২
২৯. ইব্রাহীম, মুহাম্মদ, *আফ্রিকা থেকে জ্ঞানী আমরা,* মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০০৯, পৃ. ২৯
৩০. হাসান, খন্দকার মাহমুদুল, পূবোর্ক্ত, পৃ. ৮৯
৩১. তদেব, পৃ. ৮০
৩২. তদেব, পৃ. ৮৮
৩৩. তদেব, পৃ. ৮৯
৩৪. ইব্রাহীম, মুহাম্মদ, পূবোর্ক্ত, পৃ. ৩৫
৩৫. হাসান, খন্দকার মাহমুদুল, পূবোর্ক্ত, পৃ. ৯২